রম্যরচনাকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় বাঙালি লেখক যিনি মূলত রম্য রচনার জন্য খ্যাত। তিনি বেশ কিছু উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর সবথেকে বিখ্যাত উপন্যাস লোটাকম্বল যা দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।তাঁর রচনায় হাস্যরসের সাথে তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ মেশানো থাকে। ছোটদের জন্য তাঁর লেখাগুলিও খুবই জনপ্রিয়। তাঁর সৃষ্ট ছোটদের চরিত্রের মধ্যে বড়মামা সিরিজ কাহিনি অন্যতম।

তিনি ১৯৩৬ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সে মায়ের মৃত্যুর পর, সঞ্জীবের বাল্যকাল কাটে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে। স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা থেকে রসায়ন বিদ্যায় অনার্স পাশ করেন তিনি। সরকারি চাকরি করেছেন বেশ কয়েক দিন। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু করেন। বিখ্যাত এক রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে এনালিস্টের চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় প্রথম রম্য রচনা লেখেন। সেটি প্রকাশিত হয় একটি সিনেমা পত্রিকায়। সরকারি চাকরিতে থাকাকালীন বেতার ও দূরদর্শনের নানা শিল্পসংক্রান্ত লেখা ও লিখতেন।

রঙ্গ ও ব্যঙ্গের লেখাই শুধু নয় নানা ধরনের লেখায় পারদর্শী সঞ্জীব। সরকারি চাকরি ছেড়ে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থার দেশ পত্রিকায় যোগ দেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল-

আহাম্মক	দীনজনে	একা
বাড়িবদল	দ্বিধা	চিড়িয়াখানা
মিলেনিয়াম	দ্বিতীয় পক্ষ	আড়ং ধোলাই
যদি হই মুখ্যমন্ত্রী	জুতো চোর হইতে সাবধান	বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল
গুপ্তধনের সন্ধানে	শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশচন্দ্র	ফাঁস
বুদবুদ	বিকাশের বিয়ে	এর নাম সংসার
খোল কত্তাল	শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমি	শ্বেতপাথরের টেবিল
পায়রা	সোফা-কাম-বেড	ক্যানসার
শাখা প্রশাখা	কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই	শঙ্খচিল
অগ্নিসঙ্কেত	তৃতীয় ব্যক্তি	ভারতের শেষ ভূখণ্ড
রুকুসুকু	কলকাতার নিশাচর	লোটাকম্বল
অবশেষ	দুই মামা	মনোময়
নবেন্দুর দলবল	জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ (সঞ্জয় ছদ্মনামে)	
হালকা হাসি চোখের জল	দুই সাধক মুখোমুখি	ল্যাং মারো ল্যাং
গিরিশচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীচরণকমলে	সেরা হাসির হাট
বারো ইয়ারি	মৃগয়া	আকাশ পাতাল
বারুদ	বুলেট	স্বপ্ন
কামিনী কাঞ্চন	ঝাড়ফুঁক	তুমি আর আমি
দুটি দরজা	দুটি চেয়ার	পেয়ালা পিরিচ (গল্প)
ফিরে ফিরে আসি	বসবাস	ভয়

ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ	মুখোমুখি	মুখোশের চোখে জল
রসেবসে	রাখিস মা রসেবশে	সাধের ময়না
হেঁটমুন্ড ঊর্দ্ধপদ	অজ্ঞাতবাস	ইতি তোমার মা
ইতি পলাশ	ডোরাকাটা জামা	শিউলি
হাসির আড়ালে	মুখোমুখি শ্রীরামকৃষ্ণ	গাঙচিল
কিচিরমিচির'	সাপে আর নেউলে	রাত বারোটা
কাটলেট	হেড স্যারের কান্ড	বড়মামার কীর্তি
বাঘমারি	থ্রি এক্স	সপ্তকান্ড
সাত টাকা বারো আনা	হাসি কান্না চুনি পান্না	পুরনো সেই দিনের কথা
গাধা	সুখ ১	সুখ ২
সুখ ৩	গৃহসুখ	দাদুর কীর্তি
বাঙালীবাবু	উৎপাতের ধন চিৎপাতে	বেহালা
স্বামী স্ত্রী সংবাদ	জগৎচন্দ্র হার	মাপা হাসি চাপা কান্না (সাতটি খন্ড)

শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১৯৮১ সালে আনন্দ পুরস্কার পান। ২০১৮ সালে "শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন" উপন্যাসের কারণে, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার বিজয়ী হন।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় যখন লিখতে আসেন তখন আমাদের সাহিত্যে হাস্যরস, তীর্যক চোখে চারপাশটিকে দেখা প্রায় মুছে গিয়েছিল। শিবরাম চক্রবর্তী অস্তমিত, কদিন বাদে তাঁর প্রয়াণ, পরশুরাম নেই, ত্রৈলক্যনাথ নেই। কোনো কোনো লেখকের গল্পে তীর্যকতা থাকে না যে তা নয়, কিন্তু তার চর্চা উঠেই গেছে। চারপাশের বৈসাদৃশ্যকে বিদ্রূপ, একটু বাঁকা চোখে না দেখার ভিতরে এই ধারাটি অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। অথচ তা না হলে সাহিত্য তো ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে থাকে। চারপাশের খুব গম্ভীর অনর্থকতাকে বিদ্রূপ করতে চাওয়া, তা খুব কঠিন। সবাই এটি পারেন না। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় পেরেছেন। সেই অবলুপ্তপ্রায় ধারাটিকে আবার গতিময় করে তুলেছিলেন একা। আপামর বাঙালি এই লেখকের অতি গুণগ্রাহী।

বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনকে, নিরুপায় মানুষকে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় যেভাবে কাঁটাছেঁড়া করেছেন, তা তাঁর আগে হয়নি। পূর্বে যে তিন স্মরণীয় লেখকের নাম করা হয়েছে, তাঁদের পথে সঞ্জীব যাননি। তাঁরা তিনজন ছিলেন তিন স্বতন্ত্র দৃষ্টির অধিকারী। কেউ কারোর মতো নন। সবার ব্যঙ্গের ধার ছিল অসম্ভব। সঞ্জীবও স্বতন্ত্র লেখক। গুণবান। নানা ভাবে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে প্রবেশ করে লুকোন অশ্রু খুঁজে বের করেছেন হাল্কা হাসির ভিতর দিয়ে, তীব্র হাসির মোড়কে। মনে পড়ে সেই স্মরণীয় গল্প ‘শ্বেত পাথরের টেবিল’, ‘সোফা-কাম-বেড’–এর কথা। মনে পড়ে বঙ্কিম নামের এক ৩০ বছর দাম্পত্য করা এক পুরুষের কথা। তার পরিবারের কথা। তার ৩০ বছরের পুরোনো লেপ তোষকের মতো হয়ে যাওয়া দাম্পত্য। সঞ্জীব লিখতে লিখতে গভীর এক জীবন দর্শনে পৌঁছে যান। তাঁর গল্পের হাল্কা হাসি চোখের জল আমাদের এখনো স্নিগ্ধ করে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা ছিল বর্ণনাতীত। একজন লেখক লিখে কতটা জনপ্রিয় হতে পারেন? কলকাতা বইমেলায় তাঁর বই—‘হাল্কা হাসি চোখের জল’-এর জন্য দীর্ঘ লাইন, বই শেষ, তাঁকে স্পর্শ করার জন্য বহুজন দাঁড়িয়ে। আশীর্বাদ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন দুই বৃদ্ধা। কিন্তু সেই জনপ্রিয়তা এমন বইয়ের জন্য নয়, যা আসলে ফানুশ। এত বছর বাদেও সঞ্জীবকে পড়লে সেই পুরোনো অনুভূতিই ফিরে আসে। হাসতে হাসতে উদ্গত অশ্রু লুকোন। আবার নিজের ছাল-চামড়া ছাড়ানো চেহারাটি দেখে লুকিয়ে পড়া।

লোটাকম্বল বিখ্যাত ভারতীয় বাঙালি সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসটি দেশ পত্রিকায়

ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল দুই পর্বে। পরবর্তী কালে আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে এটি দুটি খন্ডে শক্ত বাঁধাই বই হিসাবে প্রকাশিত হয়। লোটাকম্বল প্রথম খন্ড বই আকারে প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ তে আর দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ১৯৯২ এ । বই দুটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী সুনীল শীল। আনন্দ পাবলিশার্স বইটির অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশ করে ২০০৯ সালের জুনে।

এক ভেঙে যাওয়া যৌথ পরিবারের আদর্শবান আপাত কঠোর এক প্রৌঢ় পুরুষ আর তার একমাত্র মাতৃহারা যুবক সন্তান । দুই পুরুষের মূল্যবোধ আর দৃষ্টিভঙ্গির অমিলের ভিতর আর এক পুরুষ তিনি বৃদ্ধ মাতামহ । আধ্যাত্মিকতার বাতিটি জ্বালিয়ে যিনি খুঁজে পেতে চান পরমপুরুষকে । লোটাকম্বল সাধারণ ভাবে একটি হাসির উপন্যাস হলেও এই উপন্যাস ভাল লাগার মূল কারণ হল এটি একটি মূল্যবোধের উপন্যাস । মানুষের অর্ন্তমনের আধ্যাত্মিক সঙ্কটের উপন্যাস ।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখার ভিতরে এখন এক দার্শনিক প্রজ্ঞায় পৌঁছেছেন। আসলে যে জীবন আমরা যাপন করি তার টেরাবেকা দিকটার কথা বলতে বলতে দুঃখকে তিনি এমন গোপনে ছুঁয়ে যান যে আমরা নিজেদের হাড়-কঙ্কাল দেখতে পাই যেন। নিজেকে এমন ভাবে কী আর দেখা হয়? তাঁর যে গল্পটির কথা বলা হবে, সেই গল্পটি হাসির নয়। বেদনার। কিন্তু সঞ্জীবের লেখার যে তীর্যক ভঙ্গী, সেই ভঙ্গীর ভিতরেই তো তাঁকে দেখা যায় সারাক্ষণ। এখানে হাসতে চাইলেও পারা যায় না, বেদনায় নুব্জ হয়ে যেতে হয়। গল্পটি ‘বত্রিশ নম্বর বিছানা’। এক সঙ্গীত শিল্পীর গল্প। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তিনি প্রধান এক পুরুষ।

এ গল্প আরম্ভ হয়েছে সেই সময়ে যখন রেডিওতে প্রকৃত গুণী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পীরা গাইতেন। কলকাতা ‘ক’-এ রাত ১০টার সময় কখনো কখনো বড়ে গোলাম আলীর কণ্ঠ শোনা যেত। উত্তম পুরুষে লেখা এই গল্পে কথক বলছেন তাঁর সেই গুণী ওস্তাদজীর কথা। তিনিও ছিলেন বেতারের এক নম্বর শিল্পী। বেতারই ছিল গান শোনার একমাত্র উপায়। ওস্তাদজীর গান আছে শুনলে গঙ্গার ধারে জমিদার বাড়ির একটি ঘরের জানালার পাশে লেখক দাঁড়াতেন অন্ধকারে। সেই ঘরে হল্যান্ডের মস্ত রেডিও বাজত। মনে আছে, রাগ মালকৌষ। তিন তাল। গুরুজী শঙ্করনারায়ণ বলতেন, মালকোষ হলো শ্মশানের রাগ। মধ্যরাতে সেই ভাবে গাইতে পারলে ভূত নামে।

এই গল্প পড়তে পড়তে ক্রমশ ঢুকে যেতে হয় মহাসঙ্গীতের ভিতর। কী চমৎকার আলাপে আলাপে শুরু হলো এই মাড়োয়া কিংবা মালকৌষ। সঞ্জীব নিজে যেন প্রবেশ করেছেন সঙ্গীতের অদ্ভূত আঁধারে আলোয়। বেদনায় আনন্দে। এক সাধক শিল্পীর জীবনের স্খলন, আর তারপর তাঁর ফিরে আসার প্রবল চেষ্টা, ব্যর্থতা নিয়ে এই গল্প। গল্প নয় এক অদ্ভূত জীবন নাট্য যেন বা। গল্প পড়তে পড়তে ধরা যায় তিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গভীর থেকে গভীরে যেমন প্রবেশ করেছেন, তার সঙ্গে প্রকৃত শিল্পীর (যেকোনো শিল্প) সারা জীবনের সংকটকে অনুভব করতে চেয়েছেন। কথাসাহিত্যিকই পারেন অন্য শিল্পের কথায় যেতে। গল্প কথক বলছেন, তাঁর মনে পড়ে ঠুংরি গাইবার সময় মাস্টারমশায়, ওস্তাদজীর চোখ দিয়ে জল ঝরত। এই গল্প আলাপে আলাপে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে জীবনের অন্তঃস্থলে। এই যে ওস্তাদ শিল্পী, তার ছিল গান, অর্থ ছিল না। তিনি বলতেন, জাত শিল্পী না খেয়ে মরবে তবু অর্থ আর প্রতিপত্তির কাছে মাথা নোয়াবে না। সেই আত্মভোলা শিল্পীকে এক চিত্র পরিচালক তাঁর ছবির মিউজিক ডিরেকটর করলেন। ওস্তাদজীর স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটল। সংসারের সুরাহা হবে। কিন্তু হল না। ওস্তাদজী সমঝোতা করেন নি। তাঁর ছিল শিল্পীর অহঙ্কার। তিনি চটুল সুরের দিকে যাবেন না। কিন্তু সেই ওস্তাদজী পা বাড়ালেন এক ভাড়াটে বউ-এর আগুনে। সে ছিল গা ঘিনঘিনে এক সুন্দরী। পা হড়কাল।

অনিলকুমার নামের এক ব্যর্থ নায়ক ছিল ওস্তাদজীর গুরুভ্রাতা। গান থেকে অভিনয়ে গিয়ে মদ আর ফুর্তিতে সব শেষ করে ওস্তাদজীর কাছে এসেছিল। ললিতা নামের চটুল রমনীকে সে-ই ডেকে আনে ওস্তাদজীর ঘরে। সে গান শিখতে এসে গুরুজির সব্বোনাশ করল। পতন শুরু হল। এমনই হল যে তাঁর সহধর্মিণী যিনি তাঁর পাশে থেকে সমানে যুদ্ধ করেছেন, শিল্পীর অহঙ্কারে নিজে গর্বিত হয়েছেন, তিনি বাধ্য হলেন ওস্তাদজী, তাঁর স্বামীকে ত্যাগ করে যেতে। ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেলেন। সেই ললিতা, অনিলকুমার ওস্তাদজিকে শেষ করতে লাগল। সাধনার মন্দির হলো বাঈজি বাড়ি। নাচ গান আর মদ্যপান চলতে লাগল। তিনজনে মিলে ফিল্ম বানানোর পরিকল্পনা করলেন। ওস্তাদ শঙ্কর নারায়ণ আগেরবারে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, তার শোধ তোলা হবে। সেই ছবির নায়ক অনিলকুমার আর নায়িকা ওই ললিতা। শঙ্কর-ললিতা প্রডাকশন্স। ডুবলেন ওস্তাদ শঙ্করনারায়ণ।

অনিলকুমার যেমন ব্যর্থ নায়ক, ব্যর্থ গায়কও। মদ আর ফুর্তি তাকে শেষ করেছে। তাদের ফিল্ম হয়নি। অনিলকে পুষতেন ওস্তাদজি। সেই গায়ক-নায়ক অনিল এক জায়গায় গান গাইতে গিয়ে হাসির খোরাক হয়। উদ্যোক্তারা তাকে দিয়ে অনুষ্ঠান করিয়ে কিছু পাইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। হল না। এই গল্প এক শিল্পীর জীবনের গল্প। শিল্প থেকে বিচ্যুতি তাঁকে কোন অতল গহ্বরে নিয়ে গেল, সেই কাহিনি। কথক, শিল্পীর অনুরাগী মানুষটি এক প্রতিভার অপমৃত্যুর কথা বলছেন। সেই ওস্তাদজী মানুষটির কাছে তাঁর স্ত্রী ফেরত এসেছিলেন, কিন্তু সে ছিল এক অবর্ণনীয় পরিবার। তারা অন্য এক জায়গায় চলে গিয়েছিল। সেই বাসাবাড়ি খুঁজে খুঁজে গিয়ে জানা গেল তিনি হাসপাতালে।

হাসপাতালে বত্রিশ নম্বর বেডে পড়ে আছেন জীর্ণ হয়ে যাওয়া ওস্তাদ। অতবড় মানুষটি ভুগে ভুগে এইটুকু। কেউ দেখতে

আসে না। বেহুঁশ মানুষটির পাশে এক গুচ্ছ ফুল রেখে চলে এলো তাঁর অনুরাগী। পরের দিন বেড ফাঁকা। আসলে সে মৃতের পাশেই গতকাল ফুল রেখে গিয়েছিল। পরে আবিষ্কার হয় তিনি নেই। অতবড় প্রতিভার শেষ আশ্রয় সেই বত্রিশ নম্বর বিছানা। এ এক মহৎ জীবনের দিশাহীন পরিভ্রমণের গল্প। গল্পের শেষ কয়েকটি চরণ মাথা নুইয়ে দেয়। সে নিজের ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করে। সঞ্জীব আসলে জীবনের মহাসত্যকে উচ্চারণ করে গেছেন বারবার। এই গল্পে তা শিখর ছুঁয়েছে যেন।

"শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন" উপন্যাসে শ্রীকৃষ্ণ দেবতা নন নেহাতই মানুষ, যে ইচ্ছে করলেই থামিয়ে দিতে পারত মহাযুদ্ধ। আর লেখক এখানে সাংবাদিক। যে তার রূঢ় প্রশ্নে কড়া জিজ্ঞাসায় বার বার বিব্রত করেছেন কৃষ্ণকে। আর পাঁচটা মানুষের মতই শ্রীকৃষ্ণ তার জবাব দিচ্ছেন। যুক্তি সাজাচ্ছেন। বোঝাতে চেষ্টা করছেন নিজের অবস্থান। তার লড়াই। বেঁচে থাকা। এবং শেষে নিয়ম মেনে মৃত্যু।

তীক্ষ্ণ রসবোধ,সঙ্গে তীব্র শ্লেষ। সঞ্জীবিয় ব্ল্যাক হিউমারের ধারে কাছে এই মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যে অন্তত কেউ নেই। পূর্বসুরীদের ধরলে তিনি এক না হলেও অদ্বিতীয় তো বটেই। এ প্রজন্মের কেউ এখনও পৌঁছতে পারেননি পাশে। ধারে কিম্বা ভারে। একটানা পাঁচ দশকের বেশি সময় রাজত্ব করেছেন। বাংলার পাঠক তাঁর সাহিত্য ও রসবোধে সমৃদ্ধ হয়েছে বারবার। অবশেষে বিরাশি বছর বয়সে এসে মিলল স্বীকৃতি। "শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন" উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট